ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পরিবেশ অধিদপ্তরে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

(সার-সংক্ষেপ)

৫ জানুয়ারি ২০২২

পরিবেশ অধিদপ্তরে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা- নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি*
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, *পরিচালক-গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

মো. নেওয়াজুল মওলা, *রিসার্চ ফেলো, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি*

গবেষণা তত্ত্বাবধান

শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি*

গবেষণায় সহযোগিতা

সামিনা শাম্মী, *গবেষণা সহকারী, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি*

কৃতজ্ঞতা

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণা ও পলিসি বিভাগ, সিভিক এনগেজমেন্ট, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের সহকর্মীদের সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহকারী এবং গবেষণার তথ্যদাতাদের প্রতি যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন। এই গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এবং কারিগরি নানা বিষয়ে সাহায্য করার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জলবায়ু অর্থায়নে পলিসি ও ইন্টিগ্রিটি ইউনিটের সহকর্মী মো. মাহ্ফুজুল হক এর প্রতি।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন:(+৮৮০-২)৪৮১১৩০৩২,৪৮১১৩০৩৩
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট:www.ti-bangladesh.org

পরিবেশ অধিদপ্তরে সুশাসনের চ্যালেঞ্জও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ[১]

১. গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

জাতিসংঘ পরিবেশ সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে প্রতিবছর মানুষের মোট মৃত্যুর মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশ (১২.৬ মিলিয়ন) মানুষের মৃত্যু হয় পরিবেশগত বিপর্যয়জনিত কারণে। এনভায়রনমেন্টাল পারফরমেন্স (ইপি) ইনডেক্স, ২০২০ অনুযায়ী, পরিবেশ দূষণ রোধে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম একটি দেশ এবং ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬২তম। বায়ু দূষণের বিভিন্ন উপাদানের বাৎসরিক গড় উপস্থিতির হিসেবে দূষণের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে; দূষিত রাজধানীর তালিকায় ঢাকার অবস্থান দ্বিতীয় (আইকিউএয়ার, ২০২০)। বায়ু দূষণজনিত কারণে গত এক দশকে বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৩১,৩০০ জন মানুষের মৃত্যু (এইচইআই, ২০২০) হয়েছে। 'বাংলাদেশ পরিবেশ সমীক্ষা-২০১৭' অনুযায়ী-বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণজনিত কারণে প্রতি বছর জিডিপির ২.৭ শতাংশ ক্ষতি হয়। এছাড়া পোষাক উৎপাদনকারী কারখানাগুলো হতে প্রতি এক টন কাপড় উৎপাদনের বিপরীতে ২০০ টন বর্জ্য পানি নির্গমন হয় এবং বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি মাত্রার বায়ু দূষণের উৎস ইটভাটা (৩৮%), পরিবহন ১৯% এবং রাস্তার ধূলিকণা ১৮%।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮-ক অনুচ্ছেদে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতির অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ উন্নয়ন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলাসহ পরিবেশ সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে পরিবেশ অধিদপ্তর। এটি পরিবেশ আইনসহ সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তি বাস্তবায়নেও সরকারের ফোকাল প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিন্তু বিদ্যমান আইন, নীতি ও প্রবিধান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে ঘাটতি এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যর্থতাসহ পরিবেশ অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় অনিয়মের অভিযোগ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ইতোপূর্বে টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় (২০১৫) পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ) ও ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া (ইসিএ) ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ঘাটতি প্রতিফলিত হয়েছে। তবে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে সুশাসন সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ রক্ষা এবং দূষণ রোধে পরিবেশ অধিদপ্তরকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগসহ অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা ও কার্যকরতার দিকসমূহ সুশাসনের দিক থেকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য পরিবেশ অধিদপ্তরে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো-

- পরিবেশ অধিদপ্তরের আইন প্রতিপালনে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা
- পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা
- পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা ও কারণ চিহ্নিত করা; এবং
- পরিবেশ অধিদপ্তরের সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। গুণগত এবং পরিমাণগত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণাটির সময়কাল ছিলো এপ্রিল ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২১।

সারণি ১: তথ্যের ধরন, উৎস ও সংগ্রহ পদ্ধতি

তথ্যের ধরন		তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	গুণগত	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (৩০টি)	পরিবেশ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, পরিবেশ ছাড়পত্রগ্রহীতা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকতা, ইআইএ পরামর্শক এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
		পর্যবেক্ষণ (৭টি)	পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং প্রধান ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্নকার্যালয়

[১] ২০২২ সালের ৫ জানুয়ারি ঢাকায় প্রকাশিত "পরিবেশ অধিদপ্তরে সুশাসনের চ্যালেঞ্জও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক গবেষণার সার-সংক্ষেপ।

তথ্যের ধরন		তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
	পরিমাণগত	জরিপ (৩৫৩টি)	পরিবেশ ছাড়পত্রগ্রহীতা
পরোক্ষ তথ্য		বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা	সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিমালা, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিবেদন এবং ওয়েবসাইট

নমুনায়ন

পরিবেশ ছাড়পত্রগ্রহীতা শিল্প ইউনিট নির্বাচনে দুই পর্যায় বিশিষ্ট স্তরায়িত নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদানের ৯টি বিভাগ হতে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ২টি বিভাগ (ঢাকা মহানগর ও চট্টগ্রাম মহানগর) নির্বাচন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিটি বিভাগের প্রতিটি শিল্প শ্রেণি[২] হতে নিয়মতান্ত্রিক দৈবচয়ন পদ্ধতিতে পরিবেশ ছাড়পত্রগ্রহীতা শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। উভয় বিভাগেই সবুজ শ্রেণিভুক্ত শিল্প ইউনিট ছিলো ১টি করে মোট ২টি। জরিপে ২টি শিল্প ইউনিটকেই নির্বাচন করা হয়েছে। সর্বমোট ৩৫৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার জন্য সবুজ শ্রেণির নমুনা (২টি) পর্যাপ্ত না থাকায় এই শ্রেণিকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি ২: পরিবেশ ছাড়পত্রগ্রহীতা জরিপের নমুনায়ন

শিল্প শ্রেণি	ঢাকা মহানগর	চট্টগ্রাম মহানগর	মোট জরিপকৃত শিল্প ইউনিট	শতকরা হার
সবুজ	১	১	২*	০.৫৭
কমলা-ক	৫২	১০	৬২	১৭.৫৬
কমলা-খ	১০২	৬১	১৬৩	৪৬.১৮
লাল	৯৫	৩১	১২৬	৩৫.৬৯
সর্বমোট	২৫০	১০৩	৩৫৩	১০০

৪. বিশ্লেষণ কাঠামো

আটটি সূচকের আলোকে এ গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে (সারণি ৩ দেখুন)।

সারণি ৩: সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসনের নির্দেশক	পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র
আইনের শাসন	পরিবেশ রক্ষায় বিদ্যমান আইন, নীতি ও বিধি প্রতিপালনে ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ
সক্ষমতা	জনবল ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভৌত অবকাঠামো, লজিস্টিক্যাল ও প্রযুক্তি-নির্ভর ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা
স্বচ্ছতা	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ব্যবস্থা, চাহিদাভিত্তিক তথ্য প্রদান, ওয়েবসাইট ও হালনাগাদ তথ্য ব্যবস্থাপনা
জবাবদিহিতা	কার্যক্রম তদারকি, নিরীক্ষা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা
অংশগ্রহণ	অধিদপ্তরের কার্যক্রমে নাগরিক অংশগ্রহণ, গণশুনানি ও সামাজিক নিরীক্ষায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও অংশীজনদের অন্তর্ভুক্তি
কার্যসম্পাদন	ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ চিহ্নিতকরণ ও পুনরুদ্ধারে ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণ নিরূপণ ও আদায়, পরিবেশ মামলা পরিচালনা
সমন্বয়	পরিবেশ রক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়
অনিয়ম-দুর্নীতি	দুর্নীতির ক্ষেত্র, ধরন, মাত্রা ও সংঘটক

৫. গবেষণার ফলাফল

৫.১ পরিবেশ সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিমালা: প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ

[২] বিভিন্ন শিল্প শ্রেণির ব্যাখ্যার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫: এই আইনের ধারা ৩(২) তে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মহাপরিচালক নিয়োগে চাকুরির শর্ত ও যোগ্যতা, যেমন দুর্যোগ সম্পর্কিত বিশেষায়িত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদি, বিষয়গুলো নির্ধারণ না করায় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের সুযোগ রয়েছে এবং বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন নেতৃত্বের ঘাটতিও পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া ৫নং ধারায় প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনার কথা বলা হলেও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা নেই। ফলে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সীমানা নির্ধারণ করার এখতিয়ার না থাকায় প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সন্নিকটে ভারী শিল্প কারখানাসহ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ অব্যাহত রয়েছে। ধারা ৬(ক) তে পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হলেও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ও লেমিনেটেড প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করা হয় নি। ফলে পলিথিনের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে না পারার কারণে প্লাস্টিক দূষণ অব্যাহত রয়েছে।

পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০: এই আইনের অধীনে প্রত্যেক জেলায় এক বা একাধিক পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠার বিধান [ধারা ৪(১)] থাকলেও বর্তমানে সারাদেশে মাত্র তিনটি পরিবেশ আদালত ও একটি পরিবেশ আপিল আদালত রয়েছে। এর ফলে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত মামলার বিচারে বিলম্বের পাশাপাশি মামলা পরিচালনায় বাদি-বিবাদিদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের মাধ্যমে দীর্ঘ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষ করে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করার অনুমতি নিতে হয় [ধারা ৬(১)]। মহাপরিচালক বা তাঁর নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সরাসরি মামলা দায়ের করতে পারলেও সাধারণ মানুষ মামলা করতে পারে না। এছাড়া মামলার প্রক্রিয়া শেষ হতে হতে অনেক সময় পাহাড় কাটা, জলাশয় ভরাটসহ পরিবেশ ধ্বংসকারী অনেক কাজ শেষ হয়ে যায়। পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শকের লিখিত প্রতিবেদন ছাড়া পরিবেশ আদালত কর্তৃক কোনো ক্ষতিপূরণের দাবি বিচারের জন্য গ্রহণ করতে না পারায় [ধারা ৭(৪)] ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সরাসরি মামলা করা ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩: ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এর ধারা ৫-এ ইট তৈরিতে নিষিদ্ধ মাটির উৎস হিসেবে "কৃষিজমি" বলতে দুই বা তার বেশি ফসলি জমির উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে একফসলি উর্বর কৃষি জমির মাটি কেটে ইট তৈরি অব্যাহত রয়েছে। এই আইনের প্রয়োগ না হওয়ায় কৃষি ও উর্বর জমির উপরিভাগের মাটি কেটে ইট তৈরি অব্যহত থাকায় মাটি উর্বরতা শক্তি ও উৎপাদন ক্ষমতা হারাচ্ছে। এছাড়া ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হলেও [ধারা ৬] কাঠের ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। ধারা ৩(ক)-তে আবাসিক এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার ও ফসলি জমির এক কিলোমিটারের মধ্যে ইটভাটা স্থাপন নিষিদ্ধ হলেও ইটভাটাগুলো গড়ে উঠছে ফসলি জমি দখল করে লোকালয়ের পাশ ঘেঁষে। ২০১৯ সালে আইনটি সংশোধিত করে ধারা ৫(৩ক) যোগ করা হয় এবং পরবর্তীতে প্রজ্ঞাপন জারি করে মাটির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে হ্রাসকল্পে সকল সরকারি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজে পোড়ানো ইটের বিকল্প হিসেবে শুধুমাত্র সরকারি নির্মাণ কাজে পোড়ানো ইটের বিকল্প হিসেবে ব্লক ইটের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন নির্মাণ কাজে ব্লক ইটের ব্যবহার বাধ্যতামূলক না হওয়ায় বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন নির্মাণ কাজে ব্লক ইটের ব্যবহার ও প্রসারে ঘাটতি রয়েছে এবং কৃষি ও উর্বর জমির উপরিভাগের মাটি কেটে ইট তৈরি অব্যাহত রয়েছে। ফলে মাটির ব্যবহার হ্রাসে সরকারি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না হওয়ার আশংকা রয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭: এই বিধিমালার বিধি ১৩ অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্প ও শিল্পকারখানাগুলো কর্তৃক নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রায় বর্জ্য পরিবেশে উন্মুক্ত না করার নির্দেশনা থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত মাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাত্রা নির্ধারণ করা হয় নি। ফলে বিভিন্ন প্রকল্প ও শিল্পকারখানা থেকে নির্ধারিত মাত্রার চেয়েও বেশি মাত্রায় বর্জ্য নিঃসরণ হচ্ছে। বিধি ৭(২) অনুযায়ী আবাসিক এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপন না করার নির্দেশনা থাকলেও পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ফলে শব্দ, পানি ও বায়ু দূষণসহ সরকারি সম্পত্তির (পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস) অপব্যবহার এবং যে কোনো মুহূর্তে ভবন ধস, অগ্নিকাণ্ডসহ রয়েছে নানা দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য সকল শ্রেণির শিল্প কারখানার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে অনাপত্তিপত্র নেওয়া আবশ্যক [বিধি ৭(৬)] হলেও এটি ছাড়াই পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। ফলে সুযোগ পেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও নিষিদ্ধ স্থানে শিল্প কারখানা স্থাপন অব্যাহত রয়েছে।

৫.২ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

জনবল ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা: পরিবেশ অধিদপ্তরে জনবল সংকট রয়েছে। অধিদপ্তরে অনুমোদিত পদ সংখ্যা ১,১৪১টি হলেও লোকবল আছে ৪৬৫ জন (শূন্য পদের হার ৫৯.২৫%)। জনবলের ঘাটতির কারণে ছাড়পত্র প্রদানসহ অন্যান্য সেবা প্রদানে সমতা নিশ্চিত করা যায় না, যা অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী একসাথে অনেকগুলো কাজের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকায় কাজের মান হ্রাস পায়। তদারকি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করার জন্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ক্ষেত্রভিত্তিক বিশেষজ্ঞ দল নেই। আধুনিক পরিবেশগত ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের ঘাটতি থাকায় প্রায়শ দূষণ বা পরিবেশগত বিপর্যয় দ্রুত চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরে প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পর্কিত বিশেষায়িত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া প্রেষণে পদায়িত হওয়ার কারণে অধিদপ্তরের শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সরকারের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে (পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বড় উন্নয়ন প্রকল্প এবং শিল্প কারখানা স্থাপনে ছাড়পত্র প্রক্রিয়ায়) বস্তুনিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণেও ঘাটতি রয়েছে।

সারণি ৪: পরিবেশ অধিদপ্তরে জনবলের সারসংক্ষেপ

পদ	অনুমোদিত পদ (সংখ্যা)	শূন্য পদ (সংখ্যা)
১ম শ্রেণি	২৭৪	৯৪
২য় শ্রেণি	২০১	১৬৬
৩য় শ্রেণি	৪২৮	২১০
৪র্থ শ্রেণি	২৩৮	২০৬
মোট	১,১৪১	৬৭৬

ভৌত অবকাঠামো ও লজিস্টিকস: বাংলাদেশের সকল জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয় না থাকায় স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে ঘাটতি দেখা যায়। মাত্র ২১টি জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয় থাকার কারণে কোনো কোনো কার্যালয়কে একইসাথে ৩-৪টি জেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তরের অবকাঠামোগত ও লজিস্টিকসের ঘাটতি রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোতে অত্যাবশ্যক অবকাঠামো (যেমন দাপ্তরিক কাজের জন্য কক্ষ ও বসার জায়গা) ও আসবাবপত্র, এবং প্রয়োজনীয় লজিস্টিক্যাল সুবিধার (যেমন কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ) ঘাটতিরয়েছে। পরিবেশগত ছাড়পত্র আবেদন পদ্ধতি অনলাইনভিত্তিক করা হলেও প্রদান ও নবায়ন সম্পূর্ণভাবে ডিজিটালাইজড করা হয়নি। পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ড পরিচালনাসহ তদারকি ও পরিবীক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তরের কার্যক্রমে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ও রিমোট সেনসিং প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা হয় নি। ম্যানুয়ালি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করায় পরিবেশ অধিদপ্তর সঠিকভাবে দূষণের মাত্রা শনাক্ত করতে পারে না।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা: দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হওয়া সত্ত্বেও এ খাতে তারা বরাদ্দের সম্পূর্ণ অংশ খরচ করতে পারে না। পরিবেশ অধিদপ্তরের জন্য গত পাঁচ অর্থবছরে গড় বরাদ্দ ছিলো ৯৮ কোটি ৩৮ লাখ টাকা; পক্ষান্তরে গড় ব্যয় ছিলো ৮৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ বরাদ্দের তুলনায় ব্যয়ের হার ৮৬.৪০%। জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ, পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন এবং পরীক্ষা ও পরীক্ষণ/টেস্টিং ফিসহ অন্যান্য খাতে আয় করে অধিদপ্তর প্রতিবছর গড়ে ৬৫ কোটি ১১ লাখ টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করে সরকারের কোষাগারে প্রদান করে। জরিমানা, আর্থিক দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণের মাধ্যমে যে অর্থ পাওয়া যায় তা থেকে কিছু অংশ প্রণোদনাস্বরূপ পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল, সাংগঠনিক কাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করার প্রস্তাব করা হলেও তা মন্ত্রণালয় নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। তবে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন ফি আদায় অধিদপ্তরের অন্যতম আয়ের উৎস হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তারা এর আওতায় নিয়ে আসতে পারে নি। পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের চেয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের রাজস্ব সংগ্রহে আগ্রহ বেশি থাকায় তা পরিবেশ রক্ষায় অন্যতম অন্তরায় ও দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি করছে।

৫.৩ স্বচ্ছতা

পরিবেশ অধিদপ্তরে তথ্যের উন্মুক্ততা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঘাটতি বিদ্যমান। ওয়েবসাইটে অধিদপ্তরের পূর্ণাঙ্গ বাজেট ও প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য দেওয়া নেই। প্রতিবছর বিভিন্ন পর্যায়ে কী পরিমাণ দূষণ হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে ও কারা করছে তা প্রকাশ করা হয় না। মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট নেই এবং সেখানে নাগরিক সনদ প্রদর্শিত না থাকায় অধিদপ্তরের স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানা যায় না। অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার কথা থাকলেও গত দুই বছরের প্রতিবেদন এখনো প্রকাশ করা হয় নি। কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইটটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না এবং গত ছয় বছরেও পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্যচিত্র হালনাগাদ করা হয় নি। দেশের বৃহৎ প্রকল্পসহ (যেমন রামপাল, মাতারবাড়ি, পদ্মাসেতু ইত্যাদি) সব ধরনের প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় না।

৫.৪ জবাবদিহিতা

কার্যক্রম তদারকি: পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে তদারকির তদারকির সময় ইটিপি, কারখানার পরিবেশ, পানির মান, লাইসেন্সের কাগজপত্র, ল্যাবরেটরি রিপোর্ট, টাকার রশিদ, ছাড়পত্র নবায়ন ও মূল সার্টিফিকেট ইত্যাদি বিষয়গুলো নিবিড়ভাবে দেখতে হয়। অভিযোগ রয়েছে, তদারকি কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট কারখানার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সঠিকভাবে তদারকি করেন না। জরিপের আওতাভুক্ত প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিল্পকারখানায় বছরে একবারও পরিবেশ অধিদপ্তরের তদারকি হয় নি। এছাড়া উর্ধ্বতন কর্মকর্তার তদারকিতে ঘাটতি থাকায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন ছাড়পত্র হস্তান্তর করতে সময়ক্ষেপণ করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে ছাড়পত্র নিতে দালালের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিরা হয়রানির শিকার হয়। ক্ষেত্রবিশেষে শিল্প কারখানার তরল বর্জ্য (এফ্লুয়েন্ট) মানমাত্রা অনুযায়ী নিঃসরণ না হলেও তদারকি প্রতিবেদনে প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

চিত্র ১: পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে শিল্পকারখানা বাৎসরিক তদারকি
(পরিদর্শনকৃত কারখানার হার)

নিরীক্ষা: মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) কার্যালয় কর্তৃক অধিদপ্তরের ওপর গতানুগতিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। এক্ষেত্রে সিএজি’র পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে যথাযথ কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। অন্যদিকে অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা মাঠ জরিপভিত্তিক না হয়ে কেবল নথি পর্যালোচনাভিত্তিক হয়।

> **বক্স ১: “পরিবেশ অধিদপ্তরের নিরীক্ষা করার জন্য কারিগরি ও পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান জরুরি হলেও যারা নিরীক্ষা সম্পন্ন করেন তাদের এই সংক্রান্ত জ্ঞানের ঘাটতি আছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণে কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে; দূষণের হার কত; জরিমানা, আর্থিক দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণের পরিমাণ ও দূষণকারী, ইত্যাদি বিষয়ের পর্যবেক্ষণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে থাকে না। ২০০৭ সালে প্রণীত ‘এনভায়রনমেন্ট পারফরমেন্স অডিট’ এ পরিবেশ সংরক্ষণে বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন জনবল নিয়োগ না দেওয়ার পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছিলো।”**
>
> **(সূত্র: একজন মুখ্য তথ্যদাতার মন্তব্য)**

অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসন ব্যবস্থা: পরিবেশ অধিদপ্তরের বিবিধ কার্যক্রমে অনিয়ম থাকলেও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় আস্থাহীনতা রয়েছে এবং অভিযোগ প্রদানেও অনীহা রয়েছে। যেমন লিখিত অভিযোগ গ্রহণের জন্য কার্যালয়গুলোতে কোন অভিযোগ বাক্স নেই, ক্ষেত্রবিশেষে শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দায়েরকৃত অভিযোগ তদন্তে ঘাটতি রয়েছে, এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত অভিযোগগুলো আমলে নিয়ে তদন্ত ও সুরাহা করায় ঘাটতি রয়েছে। সাধারণ জনগণের অভিযোগের প্রেক্ষিতে দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অধিদপ্তর থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই প্রতিষ্ঠানের মুচলেকা নিয়ে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করা হলে প্রশাসনিকভাবে তদন্তের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। আন্তঃবিভাগীয় কোনো অভিযোগ দাখিল হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা হয় বলা হলেও ক্ষেত্রবিশেষে অভিযোগকারী কর্মীর হয়রানির শিকার হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

গণশুনানি ও সামাজিক নিরীক্ষায় অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি: পরিবেশ অধিদপ্তরেরসদর দপ্তরে প্রতি মাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার গণশুনানি অনুষ্ঠিত হলেও এর কার্যকরতায় ঘাটতি রয়েছে। গণশুনানিতে আনীত অভিযোগ নিস্পত্তি না হলে একই অভিযোগ পুনরায় মহাপরিচালক বরাবর লিখিতভাবে দিতে হয়। যেকোনো প্রকল্প শুরু করার পূর্বে এবং পরিবেশগত সমীক্ষা পরিচালনার সময় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মতামত গ্রহণে ঘাটতিরয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিবেশগত বিপন্নতা ও পরিবেশের ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মতামত পরিবেশগত সমীক্ষাতে (আইইই, ইআইএ এবং এসআইএ) প্রতিফলিত হয় না। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণে ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া অংশীজনদের পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করতে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণে ঘাটতি রয়েছে।

৫.৫ কার্যসম্পাদন

ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ চিহ্নিতকরণ ও পুনরুদ্ধারে ব্যবস্থা: ইটিপি থেকে নির্গত পানির মান সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয় না। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কম সময় নিয়ে নমুনা সংগ্রহ করার ফলে এফ্লুয়েন্ট ডিসচার্জ সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রতিবেদনে আসে না এবং ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোও চিহ্নিত করতে পারে না পরিবেশ অধিদপ্তর। পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষার পরে ‘মিটিগেশন মেজার’ পরিকল্পনা দিয়েও কোনো প্রকল্পের ঝুঁকি নিরসন না হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা বাতিল করার নিয়ম থাকলেও সরকারি বড় প্রকল্প এবং বড় বিনিয়োগের শিল্পকারখানার ক্ষেত্রে এই নিয়মের প্রয়োগ হয় না। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার কাছে রামপাল

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ ভারী শিল্প কারখানা স্থাপন অব্যাহত রয়েছে। রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের ৪ কি.মি. দূরে সুন্দরবনের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা এবং ২.৫ কি.মি. দূরে বিপন্ন প্রজাতির ইরাবতী ডলফিনের অভয়ারণ্যের ক্ষতি রোধে পরিবেশ অধিদপ্তর কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। ইউনেসকোর পর্যবেক্ষণ ও রামসার কনভেনশন মোতাবেক রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটির পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রতিবেদন ত্রুটিপূর্ণ ও সুন্দরবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত হয়। কিন্তু দফায় দফায় ইআইএ প্রতিবেদন পরিবর্তন করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর প্রথমে আপত্তি জানালেও সরকারের চাপে প্রকল্পটির বিরুদ্ধে অনড় অবস্থান গ্রহণ করে নি। পরিবেশবাদীদের আপত্তি সত্ত্বেও প্রকল্পটির বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। অন্যদিকে বায়ু দূষণের ক্ষেত্রে দূষিত রাজধানীর তালিকায় ঢাকার অবস্থান শীর্ষ পর্যায়ে হলেও দূষণ বন্ধে অধিদপ্তর সুরক্ষামূলক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

মেয়াদোত্তীর্ণ পরিবেশগত ছাড়পত্র: জরিপকৃত শিল্প কারখানার শতকরা ৫১ ভাগ মেয়াদোত্তীর্ণ ছাড়পত্র দিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যার শতকরা ৭০ ভাগ তথ্য সংগ্রহের সময় পর্যন্ত নবায়নের জন্য আবেদনই করেনি।

চিত্র ২: মেয়াদোত্তীর্ণ পরিবেশগত ছাড়পত্র নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা (শিল্প কারখানার শতকরা হার)

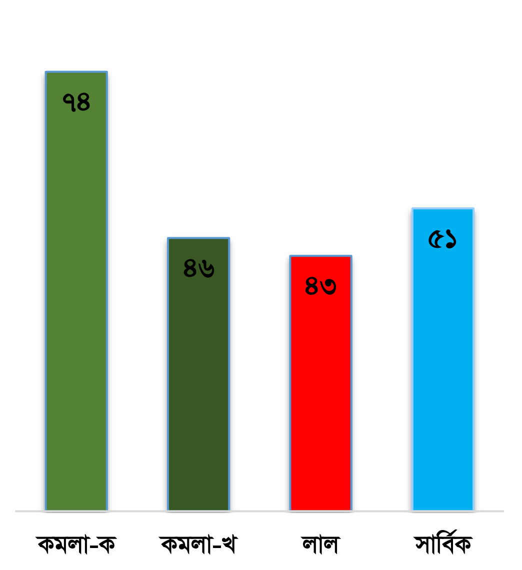

চিত্র ৩: তথ্য সংগ্রহের সময় ছাড়পত্র নবায়নের অবস্থা (শিল্প কারখানার শতকরা হার)

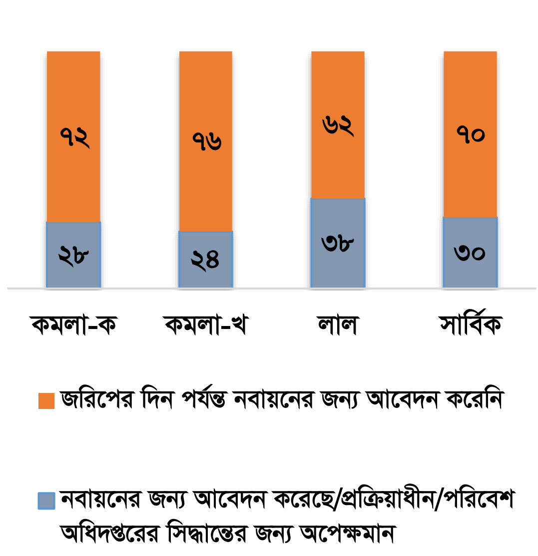

ক্ষতিপূরণ নিরূপণ ও আদায় এবং মামলা পরিচালনা: দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোনো তালিকা না থাকায় 'দূষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান' মানদণ্ডের আলোকে জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণে ঘাটতি রয়েছে। ২০১৭-১৮ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণের মাধ্যমে মাত্র ৭০ কোটি ৭৭ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে যা গত ৪ বছরে বাংলাদেশে দূষণের কারণে যে পরিমান পরিবেশগত বিপর্যয় হয়েছে তার তুলনায় নগণ্য। অন্যদিকে নির্ধারণকৃত জরিমানার বড় অংশ আপিলের মাধ্যমে ছাড় পায় দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো। ভ্রাম্যমাণ আদালতে মোট মামলার সংখ্যা ৮ হাজার ৭৫৬টি। দূষণকারীদের বিরুদ্ধে পরিবেশ আদালতে মামলা করার পরিবর্তে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে জরিমানা নির্ধারণে অধিদপ্তর বেশি আগ্রহী বলে অভিযোগ রয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে দায়ের করা মামলার বাইরেও ফৌজদারি আইনের মামলার বোঝা রয়েছে পরিবেশ আদালতের ওপরে। দেশের তিনটি পরিবেশ আদালতে ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত মামলার সংখ্যা মোট ৭ হাজার ২টি হলেও এগুলোর মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে দায়ের করা মামলার সংখ্যা মাত্র ৩৮৮টি, যা মোট মামলার সাড়ে ৫ শতাংশ। অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশ আদালতে মামলার তদন্ত প্রতিবেদন সময়মতো দাখিল ও সাক্ষী হাজির করায় ঘাটতি রয়েছে। মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইনজীবী নিয়োগ না করা। এছাড়া নির্দিষ্ট আইনজীবীদের অধিক উপার্জনের পথ সুগম রাখতে মামলা পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইনজীবী নিয়োগ না করার অভিযোগ রয়েছে।

৫.৬ সমন্বয়

যথাযথ সমন্বয় না থাকায় বিভিন্ন প্রকল্প ও শিল্প কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাতে (ইএমপি) উল্লেখকৃত নির্দেশনাবলীর যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা তদারকিতে ঘাটতি রয়েছে। সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে ইটিপির কার্যকরতা এবং

মানদণ্ড ও নির্দেশিকা অনুযায়ী বর্জ্য নিঃসরণ সংক্রান্ত বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও ঘাটতি ঘাটতি রয়েছে। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেসি বা পুলিশি ক্ষমতার জন্য অধিদপ্তরকে অন্য দপ্তরের উপর নির্ভর করতে হয়। এখানে সমন্বয়ের ঘাটতি থাকায় পরিবেশ আইনের প্রয়োগ যথাযথভাবে হয় না। পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযোগ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করতে সময় ও সুযোগমতো প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায় না। পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ের জন্য কেন্দ্রিয়ভাবে একটি কমিটি গঠন করা হলেও এর সদস্যদের ব্যস্ততার কারণে কার্যকরতায় ঘাটতি রয়েছে।

৫.৭ দুর্নীতি ও অনিয়ম

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র ছাড়াই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান: পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে সকল শ্রেণির শিল্প কারখানাকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত অনাপত্তিপত্র জমা দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু জরিপের আওতাভুক্ত শতকরা ১৭ ভাগ শিল্প কারখানা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনাপত্তিপত্র না পাওয়া সত্ত্বেও পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে।

চিত্র ৪: স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র ছাড়াই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান (শিল্প কারখানার শতকরা হার)

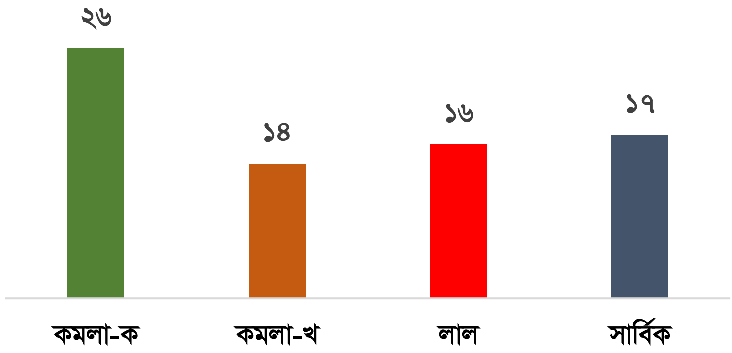

আবাসিক এলাকায় অবস্থিত শিল্প কারখানার পরিবেশ ছাড়পত্রপ্রাপ্তি: আবাসিক এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপন না করার আইনি বিধান থাকলেও জরিপের আওতাভুক্ত বেশিরভাগ শিল্প কারখানাই (৭২%) আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ক্ষেত্রবিশেষে অবৈধভাবে অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে এটি করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

চিত্র ৫: আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্রপ্রাপ্ত শিল্প কারখানা (শতকরা হার)

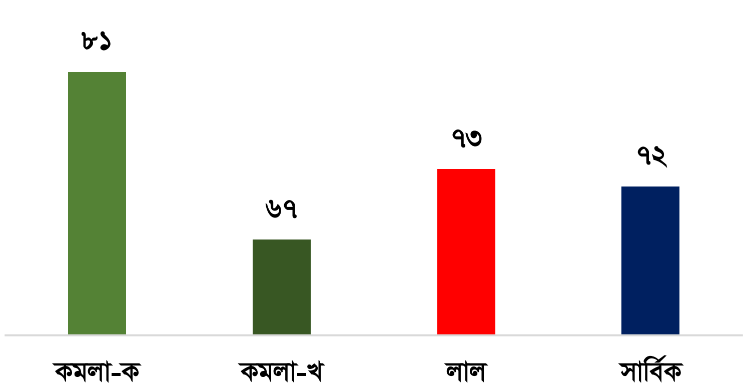

লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ইআইএ প্রতিবেদন জমা প্রদান: পরিবেশ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সাথে প্রভাবশালী আমলা এবং ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের একাংশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক থাকায় প্রভাব এবং যোগসাজশের মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ ইআইএ সম্পাদন করেও ছাড়পত্র দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে প্রকল্প শুরু হওয়ার আগে ইআইএ না করে বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে ইআইএ সম্পন্ন করা হয় এবং একে এক্সটেনশান ইআইএ'র নামে চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লাল শ্রেণি শিল্প ইউনিটের ছাড়পত্র প্রাপ্তির আগে ইআইএ প্রতিবেদন জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক হলেও জরিপের তথ্যমতে শতকরা ২২ ভাগই ইআইএ প্রতিবেদন জমা দেয় নি।

চিত্র ৬: ছাড়পত্র প্রাপ্তির আগে লাল শ্রেণির শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ইআইএ রিপোর্ট জমা দেয়ার হার

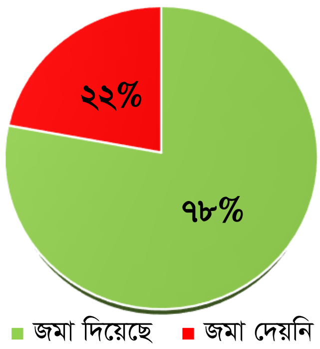

পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানে অনিয়ম: পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য কোনো কোনো কর্মকর্তার সাথে দালালের পূর্ব যোগসাজশ এবং নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের একটা অংশ প্রাপ্তির পর ছাড়পত্র প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। জরিপে শতকরা ৫১ ভাগ শিল্প কারখানায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

চিত্র ৭: পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানে অনিয়ম

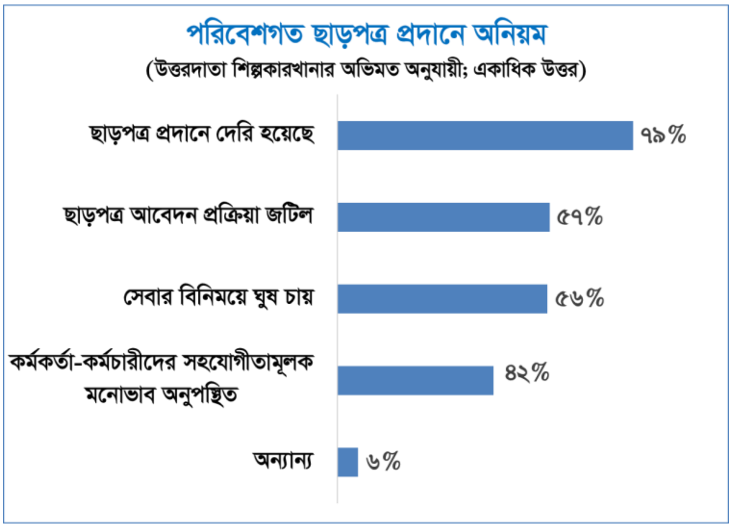

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান: কমলা-খ ও লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্প কারখানা/ প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র আবেদনের সময় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। তবে জরিপের আওতাভুক্ত শতকরা ৫৭ ভাগ শিল্পকারখানা/ প্রকল্প কোনো প্রকার পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ছাড়াই পরিবেশগত ছাড়পত্র পেয়েছে।

চিত্র ৮: পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ছাড়াই যোগসাজশের মাধ্যমে কমলা-খ ও লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্প কারখানা/প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান(*শতকরা হার*)

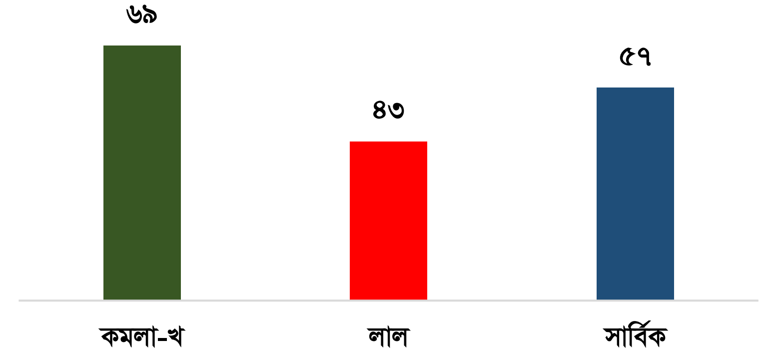

পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে যোগসাজশের মাধ্যমে নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেন: জরিপকৃত শিল্প কারখানার শতকরা ৬৬ ভাগ পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে (যেমন অনাপত্তিপত্র পাওয়া, অবস্থানগত ছাড়পত্র পাওয়া) যোগসাজশের মাধ্যমে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন করে থাকে।

চিত্র ৯: পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে যোগসাজশের মাধ্যমে নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেন
(শিল্প কারখানার শতকরা হার)

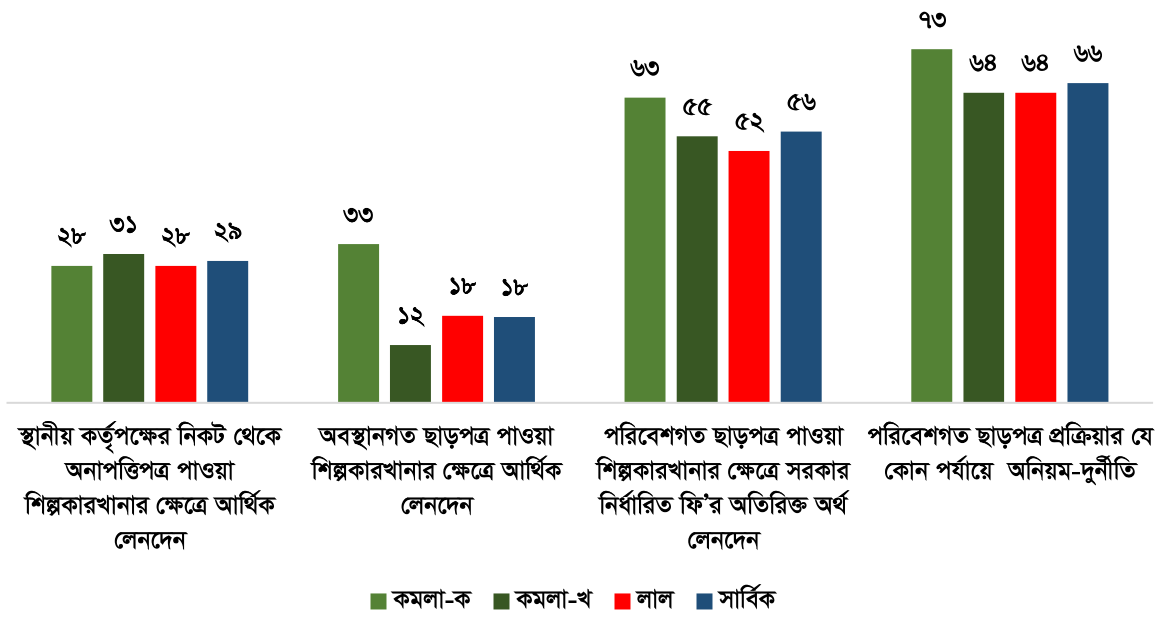

জরিপকৃত শিল্প কারখানার পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্রেণিভেদে সার্বিকভাবে সর্বনিম্ন ৩৬ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১ লাখ ৮ হাজার ৮০০ টাকা পর্যন্ত নিয়ম বহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের তথ্য পাওয়া যায়।

সারণি ৫: পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে যোগসাজশের মাধ্যমে নিয়ম-বহির্ভূতআর্থিক লেনদেনের পরিমাণ

শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধরন	স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম বর্হিভূত আর্থিক লেনদেনের গড় পরিমাণ (টাকা)	অবস্থানগত ছাড়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম বর্হিভূত আর্থিক লেনদেনের গড় পরিমাণ (টাকা)	পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম বর্হিভূত আর্থিক লেনদেনের গড় পরিমাণ (টাকা)	সার্বিক নিয়মবর্হিভূত আর্থিক লেনদেনের গড় পরিমাণ (টাকা)
কমলা-ক	৬,৪০০	৯২,০০০	১০,৫০০	৪৩,০০০
কমলা-খ	৯,৫০০	৮৬,০০০	৪৪,০০০	৩৬,০০০
লাল	৮,০০০	১,২৫,৮০০	১,৬৬,০০০	১,০৮,৮০০

**নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ পূর্ণ সংখ্যায় ওয়েটেড গড় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।*

অন্যান্য অনিয়ম ও দুর্নীতি: অধিদপ্তরের 'নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ' প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে অযৌক্তিকভাবে একই কর্মকর্তার ১০ বারসহ ১০ বছরে মোট ২৯৩ জন কর্মকর্তার বিদেশে প্রশিক্ষণের নামে ভ্রমণ বাবদ অর্থ অপচয় করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম নিয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে (আইএমইডি) প্রেরণ করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মীদের একাংশের ক্ষমতা অপব্যবহার করে এবং অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জরিমানার অর্থ মওকুফ করে দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। কারখানায় ইটিপির কার্যকরতা তদারকির সময় অধিদপ্তরের কর্মীদের একাংশের পারস্পরিক যোগসাজশে এবং নিয়ম বহির্ভূত অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে ইটিপি অচল/বন্ধ রাখা হয় ও জরিমানা করা হয়না। পরিবেশ অধিদপ্তরের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনায় অন্যতম অন্তরায় হিসেবে প্রভাবশালীদের হুমকি, হস্তক্ষেপ এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ের মৌখিক নির্দেশনা রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

৫.৮ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

একদিকে পরিবেশ সংক্রান্ত আইনের দুর্বলতা রয়েছে এবং অন্যদিকে বিদ্যমান আইন, বিধিমালাসহ সম্পূরক আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। কর্মীদের একাংশের অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে বড় অংকের নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেন এবং তা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতির ফলে পরিবেশ অধিদপ্তরে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। অধিদপ্তরের কর্মীদের একাংশের সাথে পরিবেশ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের একাংশের যোগশাজস; এবং তাদের প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করার কারণে অধিদপ্তরের কার্যকরতা ব্যাহত হচ্ছে। অধিদপ্তরের কার্যক্রমে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকে- যেমন, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, জনসম্পৃক্ততা এবং কার্যকর সমন্বয়ে ঘাটতি বিদ্যমান। একদিকে সামর্থ্যের ঘাটতি এবং অন্যদিকে সরকারের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়ে বস্তুনিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণে ঘাটতির কারণে পরিবেশ রক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে পরিবেশ অধিদপ্তর। এছাড়া কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ সরকারি বিভিন্ন বড় উন্নয়ন প্রকল্প এবং শিল্প কারখানা স্থাপনই মূলত পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী হলেও এক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ অগ্রাধিকার কার্যক্রমের অংশ হওয়ার কথা থাকলেও পরিবেশ অধিদপ্তরের বিদ্যমান ক্ষমতা প্রয়োগে ব্যর্থতা লক্ষণীয়। আমলা-নির্ভরতা, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ঘাটতি, নীরিক্ষায় ঘাটতি, পেশাগত দক্ষতার ঘাটতি এবং অনেক ক্ষেত্রে সৎ সাহস ও দৃঢ়তার ঘাটতির কারণে পরিবেশ অধিদপ্তর একটি দুর্বল, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অনেকাংশে অক্ষম ও অকার্যকর একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিণত হয়েছে।

৫.৯ সুপারিশ

১. আইনের যথার্থ প্রয়োগে ভয়, চাপ ও আর্থিক প্রলোভনের উর্ধ্বে থেকে দৃঢ়তার সাথে পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী বড় উন্নয়ন প্রকল্প এবং শিল্প কারখানাগুলোকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে।
২. প্রেষণে পদায়ন না করে অধিদপ্তরের নেতৃত্বে বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে হবে।
৩. যথাযথ চাহিদা নিরূপণসাপেক্ষে সকল কার্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ, পর্যাপ্ত অবকাঠামো, কারিগরি ও লজিস্টিক্যাল সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
৪. ওয়েবসাইটকে আরও তথ্যবহুল (যেমন নিরীক্ষা প্রতিবেদন, পূর্ণাঙ্গ বাজেট, প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ তথ্য, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে করা জরিমানা ও আদায়ের পরিমাণের ওপর পূর্ণাঙ্গ তথ্য, সব প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদন ইত্যাদি) ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।
৫. পরিবেশ সংক্রান্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তালিকাভুক্ত করে পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী ত্রুটিমুক্ত পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পন্ন নিশ্চিত করতে হবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিদপ্তরের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।
৬. প্রকল্প বাস্তবায়ন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে জড়িত সকল কর্মীর বাৎসরিক আয় ও সম্পদের বিবরণী বছর শেষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়াসহ তা প্রকাশ করতে হবে।
৭. পরিবেশ ছাড়পত্র-কেন্দ্রিক অনিয়ম-দুর্নীতি এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তি প্রদানের নজির স্থাপন করতে হবে।
৮. ইটিপির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ইআইএ প্রতিবেদন অনুযায়ী মিটিগেশন প্ল্যান ও ইএমপি তদারকি বৃদ্ধিসহ পরিবেশগত নিরীক্ষার (এনভায়রনমেন্টাল অডিট) ব্যবস্থা করতে হবে।
৯. দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও এর কার্যকর ব্যবহার করতে হবে।
১০. আইন সংশোধনের মাধ্যমে পরিবেশ আদালতে সাধারণ মানুষের সরাসরি মামলা করার সুযোগ রাখতে হবে।

পরিশিষ্ট

পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার এবং অবস্থান অনুযায়ী শিল্প ইউনিট/প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পসমূহ নিম্ন-বর্ণিত চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। ‘সবুজ’ শ্রেণির শিল্প/প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প পরিবেশের খুবই সামান্য ক্ষতি করে; ‘কমলা-ক’ পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে; ‘কমলা-খ’ এর ক্ষেত্রে পরিবেশের ঝুঁকি বেশি, এবং ‘লাল’ শ্রেণির ক্ষেত্রে ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি বা মারাত্মকক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

সারণি ৬: শ্রেণিভিত্তিক শিল্প ইউনিট/প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

শিল্প শ্রেণি	পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তিতে অত্যাবশ্যকীয় কার্যাবলী									
	আবাসিক এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপন না করা	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (আইইই)	বর্জ্য নির্গমন ব্যবস্থা	বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন (ইটিপি)	পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি)	স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র গ্রহণ	দূষণ হ্রাসসহ জরুরী পরিকল্পনা	পুনর্বাসন পরিকল্পনা	পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ)	অবস্থানগত ছাড়পত্র
সবুজ	√	X	X	X	X	X	√	X	X	X	X
কমলা-ক	√	X	X	√	X	X	√	X	√	X	√
কমলা-খ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√
লাল	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√